মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছাওয়াব
শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি

(বাংলা-**bengali**-البنغالية)

লেখক

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদক

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

1428هـ - 2007م

﴿ إهداء الثواب إلى الميت وموقف الشريعة منه ﴾

(باللغة البنغالية)

تأليف

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة

محمد شمس الحق صديق

2007 - 1428

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইছালে ছাওয়াব কি :

'ইছালে ছাওয়াব' ফারসী শব্দ। আরবীতে হবে 'ঈসালুস সওয়াব'। আভিধানিক অর্থ সওয়াব পৌঁছে দেয়া। অনেকে বলে থাকেন 'সওয়াব রেসানী।' এ শব্দটি ফারসি ভাষার হলেও, বাংলায় বহুল ব্যবহৃত বলে সাধারণ সমাজে খুবই পরিচিত। কেহ কেহ বলেন—'সওয়াব বখশে দেয়া।' নানা প্রকাশে শব্দগুলোর অর্থ ও মর্ম একই : পুণ্য বা সওয়াব প্রেরণ করা।

পরিভাষায় ইছালে ছাওয়াব হল, মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য কোন নেক আমল (সৎকর্ম) বা ইবাদত-বন্দেগী করে তা উক্ত ব্যক্তির জন্য উৎসর্গ করা।

ইছালে ছাওয়াবের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ

যে প্রিয়জন আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন, আমরা সকলেই তার জন্য এমন কিছু করতে চাই যা হবে তার জন্য কল্যাণকর ও শুভ পরিণতির বাহক। তাদের আত্মার কাছে উপহার হিসেবে পৌঁছে যাবে সে কাজের প্রতিফল ; ফলে আল্লাহ তাদের ইহকালিন পাপ মোচন করে সুখে রাখবেন তাদেরকে, ভরিয়ে দিবেন নানা সমৃদ্ধিতে। এ উদ্দেশ্যে কিছু সৎকর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে আমাদের আগ্রহের কমতি নেই। এ মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের লোকেরা নিজেদের বিশ্বাস, প্রথা, রেওয়াজ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:—

১- কুলখানি

কুলখানি ফারসি শব্দ। আভিধানিক অর্থ কুল পড়া—পবিত্র কুরআনের ত্রিশতম পারার যে সকল সূরার শুরুতে কুল শব্দ রয়েছে সেগুলো পাঠ করা। কিন্তু পরিভাষায় কুলখানির অর্থ একটু ভিন্ন: কোন ব্যক্তির ইন্তেকালের তিন দিনের মাথায় তার মাগফিরাত ও আত্মার শান্তি কামনা করে মীলাদ বা কুরআন খতম অথবা অন্য কিছু পাঠের মাধ্যমে দুআ-মুনাজাতের অনুষ্ঠান করা। অনুষ্ঠান শেষে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য খাবার বা মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করা হয়, যাকে বলা হয় তাবারুক। কুলখানির আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক বা ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে বিধান করা যেতে পারে যে, কোন এক সময় মৃত ব্যক্তিদের ইছালে ছাওয়াবের জন্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুল বিশিষ্ট তিনটি অথবা চারটি সুরা পাঠ করা হত, অথবা সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করা হত ; পরবর্তীতে এ অনুষ্ঠানটিকে সম্প্রসারিত করে তাতে অন্যান্য বিষয় যোগ করা হয়েছে। তবে কুলখানি নামটি রয়ে গেছে।

২-ফাতেহা পাঠ

'ফাতেহা পাঠ' এর অর্থ, বলা যায়, সর্বপরিচিত : সূরা ফাতেহা পাঠ করা। তবে, পরিভাষায় মৃত ব্যক্তির কবরে উপস্থিত হয়ে তার জন্য সূরা ফাতেহা বা সংক্ষিপ্ত দুআ-প্রার্থনা করা। যেমন, আমরা প্রায়ই খবরে শুনে থাকি, প্রেসিডেন্ট অমুক নেতার কবরে যেয়ে ফাতেহা পাঠ করেছেন ; এটাকে ফাতেহা-খানিও বলা হয়। এ থেকে ফাতেহা ইয়াযদাহম[১] ও ফাতেহা দোয়াযদাহম[২] এর উৎপত্তি। ফাতেহার আরেকটি

---

[১] ফাতেহা ইয়াযদাহম : রবিউস্‌সানী মাসের এগার তারিখে আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.) এর ওফাত দিবস পালন।

[২] ফাতেহা দোয়াযদাহম : ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে নবী কারিম (সা.) এর মৃত্যু দিবস পালন।

প্রচলিত রূপ আছে। তাহল কোন অলী বা বুযুর্গের সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে খানা পাকানোর পর তাতে দুআ-দরূদ বা সুরা-কালাম পড়ে ফুঁক দেয়া ও তারপর তা বিতরণ করা।[৩]

আমি এক অনুষ্ঠানে দেখেছি আয়োজকরা কয়েকটি ডেগে খিচুড়ি পাক সেরে বসে আছেন। শত শত লোক লাইনে দাড়িয়ে আছে খিচুড়ী পাওয়ার জন্য। দুপুর গড়িয়ে বিকাল এসে যাচ্ছে। লোকজন অস্থির হয়ে যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু বিতরণ করা হচ্ছে না। বিতরণ না করার কারণ জিজ্ঞেস করে জানা গেল এ খিচুড়ি রান্নার উপর ফাতেহা পাঠ করা হয়নি এখনো। এর উপর ফাতেহা পাঠ না করলে তা খাওয়া হালাল হবে না কারো জন্য। অনেক অপেক্ষার পর কাঙ্ক্ষিত পীর সাহেব আসলেন। এক গামলা খিচুড়ি তার সামনে আনা হল। তিনি কিছু একটা পাঠ করে তাতে ফুঁক দিলেন। গামলার এ খিচুড়ি আটটি ডেগে বন্টন করে মিশিয়ে দেয়া হল। ব্যস! এই ফাতেহার কারণে এখন তা সকলের জন্য হালাল হয়ে গেল।

৩-চেহলাম

চেহলাম ফারসি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ চল্লিশতম। অনেকে চেহলামকে চল্লিশা বলেন। পরিভাষায় চেহলাম বলা হয় মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মীলাদ, কুরআন খতম, দুআ-মুনাজাত ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা। অনুষ্ঠান শেষে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা থাকে।

৪-মাটিয়াল

মাটিয়াল শব্দের প্রচলন গ্রামাঞ্চলে বহুল প্রচলিত। মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন বা মাটি দিতে যারা অংশ গ্রহণ করে, তাদের উদ্দেশ্যে ভোজ আয়োজন করাকে বলা হয় মাটিয়াল খাওয়ানো। গ্রামে দেখেছি, মৃত ব্যক্তির যখন দাফন সম্পন্ন হয়, তখন একজন ঘোষণা করে যে, অমুক তারিখ অমুক সময় মাটিয়াল খাবার হবে, আপনাদের দাওয়াত রইল। অনেক সময় দেখেছি, ঘোষণা না এলে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্য থেকেই প্রশ্ন আসে যে, মাটিয়াল কবে হবে? গ্রাম্য সংস্কৃতিতে এ অনুষ্ঠান করার জন্য একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। এটা দাফন ও জানাযায় অংশ নেয়ার জন্য এক ধরনের পারিশ্রমিক বলা চলে।

৫-মীলাদ

মীলাদ আরবী মাওলিদ শব্দ থেকে উদ্ভুত। মাওলিদ অর্থ হল কোন ব্যক্তির বিশেষ করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মকাল, জন্মস্থান এবং জন্মোৎসব। জন্মক অর্থেও মীলাদ শব্দের ব্যবহার হয়। এই উপমহাদেশে মাওলিদ শব্দের পরিবর্তে মেলুদ বা মৌলুদ শরীফ আখ্যা প্রচলিত আছে। কিন্তু অধুনা মীলাদ শব্দটি বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত ১২ রবীউল আওয়াল তারিখে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিন উপলক্ষে এই উৎসব উদযাপিত হয়। তবে যে কোন ব্যক্তির জন্মদিন, নতুন ব্যবসায়ের সুত্রপাত, গৃহ নির্মাণ সমাপ্তি, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বছরের যে কোন সময় মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

মিসরে ফাতেমী আমলের মাঝামাঝিকালে এবং শেষের দিকে মাওলিদুন-নবী অনুষ্ঠানের কিছু আভাষ পরিলক্ষিত হয়। তবে মাওলিদের আদি উৎস সম্পর্কে মুসলিম গ্রন্থাকারগণ যে ঐকমত্য প্রদান করেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মাওলিদ অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম সালাহ-আল-দীনের ভগ্নিপতি আল মালিক আবু সাঈদ মুজাফফর আদ-দীন কোকবুরী (মৃত ৬৩০ হিজরী) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়।

---

[৩] ইছলাহুর রুসুম : আশরাফ আলী থানবী (রহ.), পৃষ্ঠা ১২১

৬০৪ হিজরী অর্থ্যাৎ ১২০৭ খৃষ্টাব্দে ইরাকের মুসেল শহরের কাছে আরবালা নামক স্থানে ১২ রবিউল আওয়াল তারিখে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিন উপলক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান এই মীলাদ বা মাওলিদ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। অন্যান্য লেখকগণও একই ধরনের বিবরণই দিয়ে আসছেন। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) এ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম হুসনিল মাকসিদ ফী আমালিল মাওলিদ।

আরবালাতে অবস্থানকালে কোকবুরীর প্রস্তাবক্রমে ইবনে দিহয়া তার 'কিতাবুত-তানবীর ফী মাওলিদিস সিরাজ' রচনা করেন। ... তবে
সর্বযুগেই মুসলিম সমাজে আরবালাতে অনুষ্ঠিত এ মাওলিদের বিরোধিতা দেখা যায়। প্রতিপক্ষের মতে এই উৎসব একটি বিদ'আ অর্থাৎ ধর্মে নব উদ্ভাবিত প্রথা এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। কিন্তু বহু মুসলিম রাষ্ট্রে বিশেষ করে এই উপমহাদেশে জনগণের ধর্মীয় জীবনে মীলাদ সুপ্রতিষ্ঠিত আসন লাভ করায় এই অনুষ্ঠান অনেক আলেমের সমর্থন লাভ করে। তারা এই বিদআতকে নীতিগতভাবে 'বিদআতে হাসানা' রূপে স্বীকৃতি দেন। তাদের অভিমত মীলাদ সাধারণ্যে প্রচার লাভ করার ফলে কতগুলি সৎকাজ আনুসঙ্গিকভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ, তাঁর উদ্দেশ্যে দরুদ ও সালাম পেশ, দান-খয়রাত ও দরিদ্রজনকে আহার্য দান। অবশ্য মীলাদের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের অভিমত অনুযায়ী মীলাদ সামা' সূফীগনের নৃত্য (তুরস্ক) এবং ভাবোচ্ছাসমূলক অনৈসলামিক কার্যকলাপের জন্য এ অনুষ্ঠান পরিত্যাজ্য। তারা এ কথাও বলেন যে, এক শ্রেণীর লোক মীলাদকে ব্যবসারূপে গ্রহণ করে এবং এমন অলৌকিক কল্প-কাহিনী বর্ণনা করে যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃত সীরাত অলীক ও অবাস্তব কাহিনীর আড়ালে পড়ে যায়।[৪] মীলাদ সম্পর্কে যে কথাগুলো এতক্ষণ বলা হল তা আমার কথা নয়। সম্পূর্ণটাই বাংলাপিডিয়া থেকে নেয়া।

প্রচলিত অর্থে মীলাদ বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বুঝায়, যেখানে কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে কুরআনের অংশ বিশেষ পাঠ, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ, তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি, দুআ-মুনাজাত ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এর নির্দিষ্ট কোন রূপ বা নিয়ম-কানুন নেই। অঞ্চলভেদে এর অনুষ্ঠান বিভিন্নরূপে দেখা যায়। এ যে শুধু মৃত ব্যক্তির জন্য করা হয়, তা নয় ; বরং কখনো কোন দোকান, বাড়িঘর উদ্বোধনসহ বিভিন্ন উপলক্ষে মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মীলাদের অর্থ জন্ম হলেও কারো জন্মদিনে এর আয়োজন খুব একটা নজরে পড়ে না ; বরং মৃত্যু দিবসেই এর আয়োজন চোখে পড়ে বেশি। তবে কারো জন্ম দিনে মীলাদ পড়তে হবে, এ দাবি কিন্তু আমরা করছি না। এ মীলাদ মাহফিল সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় ইছালে ছাওয়াব তথা মৃতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত অনুষ্ঠান আকারে।

বাংলাপিডিয়াতে মীলাদের যে ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে তা যে সঠিক সে ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। বাংলাপিডিয়ার এ বিবরণ থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় অবগত হলাম : এক. ইসলামে মীলাদ একটি নুতন আবিস্কার। কারণ রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম অথবা তাদের পরে ইসলামের অনুসরণীয় যুগে এর অস্তিত্ব ছিল না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের প্রায় ৫৯৪ বছর পর এর প্রচলন শুরু হয়। অতএব তা ইসলামে অনুমোদিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আবিস্কার-উদ্ভাবনের বিষয় নয়। বরং, কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবাদের আচরণে তার উপস্থিতি অপরিহার্য। দুই. মীলাদ মাহফিলের প্রচলনের পর থেকে একদল উলামায়ে কেরাম এর বিরোধিতা করে আসছেন।

---

[৪] বাংলাপিডিয়া

উম্মতে মুসলিমার উলামাগণ কখনো মীলাদের স্বপক্ষে একমত হননি। তিন. যে সকল আলেম ওলামা মীলাদকে সমর্থন করেন তারাও স্বীকার করেন যে মীলাদ বিদআত ক্রিয়া বা ধর্মে নব-আবিস্কার। অবশ্য তাদের বক্তব্য এটা বিদআতে হাসানা বা সুন্দর বিদআত। ইসলামে বিদআতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি না, এবং এটা গ্রহণযোগ্য কিনা তা একটু পরে আলোচনা করছি। চার. যে ব্যক্তি মীলাদের প্রচলন করেন তিনি কোন ইমাম বা আলেম ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বাদশা। তবে তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না। অনুসরণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নতো অনেক দূরে। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন, 'সে ছিল এক অপচয়ী বাদশা। প্রজাদের বাইতুল মাল থেকে লক্ষ-লক্ষ টাকা আত্মসাত করে তা দিয়ে মীলাদের আয়োজন করত। তার সম্পর্কে ইমাম শামসুদ্দীন আজ যাহাবী রহ. বলেন : 'সে প্রতি বছর মিলাদুন্নবীর নামে তিন লক্ষ দিনার খরচ করত।"[৫]

মিশরে মীলাদ সম্প্রসারিত হয় সূফীদের মাধ্যমে। এই মিলাদের আঙ্গিক তুর্কী রীতি-নীতির আতিশয্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। প্রায় সব যুগেই মীলাদকে একটি বিদআত অনুষ্ঠান বিবেচনা করেই হক্কানী আলেমদের পক্ষ হতে এর বিরোধিতা করা হয়েছে। হিজরী ৯৯৪ মোতাবেক ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে উসমানী সাম্রাজ্যের সুলতান তৃতীয় মুরাদ মীলাদকে এই উপমহাদেশে এবং তুরস্কে নব আঙ্গিকে প্রবর্তন করেন।[৬]

চলমান আলোচ্য বিষয় মীলাদ নয়। তবে ইছালে ছাওয়াবের একটি প্রচলিত বড় পদ্ধতি হিসেবে এখানে অতিসংক্ষেপে তার আলোচনা করা হল। এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে হাকীমুল উম্মত আশ্রাফ আলী থানবী রহ. সংকলিত 'ইসলাহুর রুসুম' এবং তাঁরই সংকলিত আরেকটি বই 'শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী', মুফতী ইবরাহীম খান সংকলিত 'শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার' পাঠ করা যেতে পারে। এ ছাড়া এ বিষয়ে হক্কানী উলামায়ে কেরাম কর্তৃক সংকলিত বহু বই-পুস্তক রয়েছে।

৭-খতমে তাহলীল

খতম শব্দের অর্থ শেষ। তাহলীল শব্দের অর্থ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতএব খতমে তাহলীলের অর্থ হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ শেষ করা। পারিভাষিক অর্থে এক লাখ বা সোয়া লাখ বার লা-ইলা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা। এ যেমন এককভাবে আদায় করা হয়, তেমনি কিছু সংখ্যক লোক একত্র হয়ে পাথর বা কোন দানা গুনে গুনে এ খতম আদায় করে থাকে। সাধারণত: কোন লোক ইন্তেকাল করলে তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য এ খতমের আয়োজন করা হয়। অনেকে আবার নিজেই মৃত্যুর পূর্বে নিজের খতমে তাহলীল—এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ বার লা-ইলা ইল্লাল্লাহ—পড়ে নেন ; এবং নিকটজনকে বলে যান—আমি কিন্তু আমার খতমে তাহলীল আদায় করে গেছি, তাই আমার মৃত্যুর পর তোমাদের এ ব্যাপারে চিন্ত া করতে হবে না। একাধিক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন : হুজুর, আমি যদি আমার সোয়া লাখ কালেমা পড়ে খতমে তাহলীল আদায় করে যাই তাহলে আদায় হবে না? আমার মৃত্যুর পর কি আবার আদায় করতে হবে? এ প্রশ্ন প্রমাণ করে যে, সমাজে একে আদায় করা জরুরি মনে করা হয় এবং স্নেহময়ী মাতা-পিতা তার সন্তানদের বোঝা হালকা করে মৃত্যুর পূর্বেই তা আদায় করে যেতে চান ; তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের যেন সোয়া লাখ কালেমার বোঝা বহন করতে না হয়।

৮-কুরআন খতম বা কুরআনখানি

মৃত ব্যক্তির প্রতি সওয়াব পাঠানোর জন্য কুরআন খতম বা কুরআন খতমের অনুষ্ঠান করা হয়। মৃতের জন্য কুরআন খতমের এ রেওয়াজ এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, দীন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বহু

---

[৫] শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার : মুফতী ইবরাহীম খান, পৃ:৪৮

[৬] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সংখ্যক মুসলমান মনে করেন : কুরআন নাযিল হয়েছে মৃত ব্যক্তিদের জন্য মুক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। ছাত্র জীবনে আমাকে আমার এক প্রতিবেশী উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক তার পিতার মৃত্যু দিবসে কুরআন খতমের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দাওয়াত দিলেন। আমি যেতে অস্বীকার করলাম। তিনি মন্তব্য করলেন, মৃতের জন্য কুরআন খতমে অংশ নিবে না তাহলে কুরআন হেফজ করেছ কেন? মৃতের জন্য কুরআন পাঠ না করলে কুরআন আর কি কাজে আসবে?

এলাকার এক বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন গান ও মিউজিকের আওয়াজ শুনতে পেতাম। অবিরাম গানের আওয়াজে তার অনেক প্রতিবেশী বিরক্ত হতেন। একদিন দেখা গেল গান ও মিউজিকের বদলে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসছে। কৌতূহলী লোকজন কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখল তাদের এক নিকট আত্মীয়
ইন্তেকাল করেছে। সে কারণে তারা কুরআন তিলাওয়াতের ক্যাসেট চালাচ্ছে। এ ধরনের মুসলমানদের ধারণা যতসব গান-বাজনা আছে তা জীবিতদের জন্য। আর কুরআন হল মৃতদের জন্য। অথচ আল্লাহ বলেন—

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿69﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿70﴾ (يس)

এতো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন ; যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। (সূরা ইয়াসীন : ৬৯-৭০)

কুরআন খতমের যত অনুষ্ঠান হয়, তার পঁচানব্বই ভাগই মৃত ব্যক্তির জন্য উৎসর্গিত। বাকিগুলো ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, বিদেশ যাত্রায় সাফল্য, চাকুরি লাভ, পরীক্ষায় পাস, মামলা-মকদ্দমায় খালাস, দোকান, বাড়িঘর, লঞ্চ-জাহাজ, বাস-ট্রাকের উদ্বোধন—ইত্যাদি উদ্দেশ্যে করা হয়। মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য কুরআন খতম করে বিনিময় গ্রহণ জায়েয কি-না, এ নিয়ে বিতর্ক দেখা যায় আলেম-উলামাদের মাঝে। মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করলে তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয—এ রকম ঐক্যমতের খবরও শোনা যায় সংশ্লিষ্ট মহলে। আর পারিশ্রমিক দিয়ে কুরআন খতমের ব্যবস্থা সর্বত্রই দেখা যায়। অথচ বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে কতটুকু সহীহ তা ভাবতে চায় না অনেকেই।

হানাফী ফিকাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফাতাওয়া শামিয়াতে বলা হয়েছে : "মৃত ব্যক্তিদের জন্য কুরআন পাঠ করার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা মাকরূহ এবং খতমে কুরআনের জন্য সাধু সজ্জন ও কারীদের সমবেত করা নিষিদ্ধ।"[৭]

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী 'মাদারিজুন নবুয়াহ' গ্রন্থে লিখেছেন: "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র যুগে মৃতের জন্য জানাযা নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সমবেত হওয়া ও কুরআন তিলাওয়াত করা বা খতম করার রীতি ছিল না- কবরের কাছেও নয়, অন্য স্থানেও নয়- এসব কাজ বিদআত ও মাকরূহ।"[৮]

৯-কাঙ্গালীভোজ

মৃত ব্যক্তিদের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান করা হয় তার একটি হল কাঙ্গালীভোজ। এর অর্থ সকলের জানা। মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনায় দরিদ্র অসহায় লোকদের জন্য খাবারের আয়োজন করা। এটা সামাজিকভাবে প্রচলিত হলেও কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত। যদি এর আয়োজনকারীরা

---

[৭] ফাতাওয়া ও মাসাইল ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ৩০৬

[৮] ফাতাওয়া ও মাসাইল ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ৩০৭

সত্যিকারার্থে ছাওয়াবের জন্য করে থাকে, অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে এবং অবৈধ টাকা বা জোর-জবরদস্তি করে আদায় করা চাঁদার টাকা দিয়ে না হয় এবং যাদের খাবার দেয়া হবে, তাদের কোন কষ্ট না দেয়া হয়, তবে, সন্দেহ নেই, এটা খুবই ভাল ও ছাওয়াবের কাজ। এটা একটা ছদকাহ। আল্লাহ ও তার রাসূল মানুষকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করেছেন এবং এর জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

১০-ওরস

ওরস বা উরস আরবী শব্দ। মূল অর্থ, বিবাহের জন্য কনেকে বরের গৃহে নিয়ে যাওয়া। বিবাহ ও বিবাহ উপলক্ষ্যে খানা-পিনাকে উরস বলা যায়।[৯] নব-বধূ বরণ বা নব-বর বরণ। পরিভাষায় মাজার বা কবর-কেন্দ্রিক মেলাকে ওরস বলা হয়। যারা কবর-কেন্দ্রিক ব্যবসা ও ইবাদত-বন্দেগী করে, ওরস তাদের জন্য একটা লাভ জনক বাণিজ্য। যারা ওরস করে তারা কবরবাসীদের জন্য ছাওয়াবের জন্য করে। আরো উদ্দেশ্য হল, কবর বা মাজারে শায়িতদের থেকে ফয়েজ ও বরকত লাভের বিশ্বাস। যারা এ সব মাজার ও কবরে আসেন, তাদের সকলের উদ্দেশ্য ইছালে ছাওয়াব নয় ; অনেকে নানা মকসুদ নিয়ে আসেন যা মাজারের নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। ওরসে কী কী বিষয় থাকবে এর নির্দিষ্ট ধরাবাধা নিয়ম নেই। তবে, সাধারণত যা থাকে তা হল—গান-বাজনা, কবরে সেজদা, মারফতি গান ও বয়ান, তাবারুক বিতরণ, মীলাদ—ইত্যাদি। কারা ওরস করতে পারবে কারা পারবে না—এরও কোন নীতিমালা নেই। ব্যবসা বাণিজ্য এমনকি জন-সেবা করতে হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয় ; কিন্তু এ ব্যবসার জন্য কোন অনুমতি লাগে না। যার ইচ্ছা যেখানে খুশি আয়োজন করতে পারে। তবে কবর বা মাজার হল এর জন্য উর্বর স্থান।

১১-ইছালে ছাওয়াব মাহফিল

আমাদের দেশের অনেক স্থানে ইছালে ছাওয়াব-মাহফিলের আয়োজন করতে দেখা যায়। আয়োজনকারীদের উদ্দেশ্য হল, আম্বিয়া, আউলিয়া, পীর-দরবেশসহ সকল মৃত মুসলমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা, তাদের জন্য দুআ করা। এ মাহফিলে জীবিত-মৃত আউলিয়া-বুজুর্গ, পীর-দরবেশ ও তাদের খাদেম ভক্তদের কেরামত বয়ান করা হয়। ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে আয়োজক দরবারের দিকে আকৃষ্ট করা হয়। আল্লাহর কাছে এ দরবার ছাড়া আর কোন প্রিয় দরবার যে নেই এটা জোর-জবরদস্তি করে বুঝানো হয় সাধারণ মানুষকে। মীলাদ পড়া হয়। দরবারে অবস্থিত মাদরাসা, মসজিদ ও খানকাহর জন্য চাঁদা তোলা হয়। সর্বশেষে, আখেরি মুনাজাত ও তাবারুকের ব্যবস্থা থাকে।

১২-উরসে-কুল

উরসে-কুল শব্দের অর্থ সকলের জন্য ওরস। দেশের কোন কোন সূফী সম্প্রদায় এ পদ্ধতিতে মৃতদের জন্য ইছালে ছাওয়াব পালন করে থাকেন। কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে গোলাকার হয়ে বসে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাছ ও তাদের দলীয় বিশেষ একটি দরুদ পাঠ করে মুনাজাতের মাধ্যমে সওয়াব বখশে দেন সকল নবী, অলি ও মুসলমানদের জন্য। সাধারণত দৈনিক এশার নামাজের পর তারা এ অনুষ্ঠান করেন। কেহ করেন সপ্তাহে একদিন। এছাড়া, কেন্দ্রীয় আকারে এ অনুষ্ঠান করা হয়। এ দলের অনুসারীদের কেন্দ্র হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। এ দলের লোক ব্যতীত অন্য কাউকে এ পদ্ধতিতে ইছালে ছাওয়াব পালন করতে দেখা যায় না। দলটির শ্লোগান হল—বিনা পয়সায় দিন-দুনিয়ার শান্তি।

১৩-কবরে ও কফিনে ফুল দেয়া বা পুষ্পস্তবক অর্পণ

[৯] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খন্ড

বহু মানুষকে দেখা যায়, নিজের প্রিয়জন বা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের কবরে ও কফিনে ফুল দেন। কবরে অর্পণ করেন পুষ্পস্তবক। এমনকি, তাদের প্রতিকৃতিতেও ফুল দিয়ে থাকেন। তবে, তারা সকলে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বা সওয়াব পাঠানোর নিয়তে করেন কি-না, অথবা মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসর অর্ঘ্য অর্পণের উদ্দেশে করে থাকেন, তা অবশ্য জিজ্ঞাস্য। তবে আমার ধারণা, তাদের অধিকাংশই পাশ্চাত্যের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী শক্তির অনুকরণে মৃত ব্যীক্তর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অর্ঘ্য অর্পণের উদ্দেশে এমনটি করেন। যদি এটা মৃত ব্যক্তির আত্মার কাছে সওয়াব পাঠানোর জন্য করা হয়, তবে এক কথা ; আর যদি সওয়াব পাঠানোর নিয়ত না করে শুধু প্রথা-পালনের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে ভিন্ন কথা। প্রথমটি বিদআত আর দ্বিতীয়টি কুফুরি। কর্তা কাফের হয়ে যাবে কিনা তাতে সন্দেহ থাকলেও তার কাজটা যে কুফুরি, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। আমি শুনেছি, এক আলেমকে কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : এটা ইসলামী শরীয়তে জায়েয কি না? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে খেজুরের ডাল স্থাপন করেছেন। তার কাছে তখন যদি ফুল থাকত তাহলে তিনি কি ফুল দিতেন না? তখন খেজুর ডাল পাওয়া সহজ ছিল। অন্য কিছু হাতের কাছে সচরাচর পাওয়া যায়নি, তাই তিনি খেজুরের ডাল দিয়েছেন। অতএব, শুধু খেজুরের ডাল নয়, যে কোন পুষ্প কবরে অর্পণ করা সুন্নত হবে। আসলে এটা একটা বিভ্রান্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুটো কবরে খেজুর ডাল স্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে তাকে আল্লাহর পক্ষ হতে জ্ঞাত করা হয়েছিল যে, কবর দুটোর বাসিন্দাদের শাস্তি হচ্ছে।

হাদীসটি নিম্নরূপ:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال : إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري 216 ومسلم 292

ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলেন : ‘এ কবরবাসী দুজনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এদেরকে কোন বড় অপরাধের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, বরং এদের একজন চোগলখুরী করে বেড়াত, আর অপরজন প্রসাবের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করত না। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছের একখানা কাঁচা ডাল আনিয়ে তা দু টুকরা করে প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে গেড়ে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এরূপ করেছেন কেন? তিনি বলেন, খুব সম্ভব ডাল দু’টি না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব হাল্কা করে দেয়া হবে।’[১০]

অর্থাৎ, তিনি শাস্তি লাঘবের জন্য খেজুর ডাল স্থাপন করেছেন। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে এ দু লোকের শাস্তি হচ্ছে। তাই তিনি এ দুটো কবর ব্যতীত অন্য কোন কবরে কিছু স্থাপন করেছেন—এমন প্রমাণ নেই। জীবনে বহু প্রিয়জনের কবর যিয়ারত করেছেন তিনি, কোথাও খেজুরের ডাল বা পুষ্প অর্পণ করেননি। অতএব, এ বিষয়টি শুধু এ দু কবরের জন্যই করার নির্দেশ ছিল। এটা যদি সাধারণ নির্দেশ হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন কবরেও খেজুরের ডাল বা এ জাতীয় কোন কিছু স্থাপন করতেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন এবং ইমামগণ

[১০] বুখারী : ২১৬,ও মুসলিম : ২৯২

অতিবাহিত হয়েছেন কেহই এটা করেননি। সকল ইমামগণ একমত যে, এ বিষয়টি শুধু রাসূলুল্লাহর একান্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্য কারো জন্য নয়।[১১]

বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে যে সাহাবী বুরাইদা ইবনুল হাসীব আল-আসলামী অসীয়ত করেছিলেন যে, তার ইন্তেকালের পর তার কবরের উপর যেন দু'টি খেজুর ডাল স্থাপন করা হয়। তিনি এটা করেছেন রাসুলের আমল দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে। এ কাজ দ্বারা সকলের জন্য কবরে পুস্প দেয়া সুন্নাত প্রমাণিত হয় না। এটা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার।[১২]

১৪-এক মিনিট নীরবতা পালন

মৃত ব্যক্তির জন্য এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করতে দেখা যায় অভিজাত ও উচ্চ মহলে। বড় ধরনের কোন অনুষ্ঠানে, যেখানে সমাজের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন, সেখানে যদি কোন মৃত ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিছু করা হয়, তবে তাহল দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন। কখনো কখনো এক মিনিট নীরবতা পালন করার পর মুনাজাত করা হয়। কেন যে মৃত ব্যক্তিদের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয় তা প্রশ্নের ব্যাপার। যখন নীরবতা পালন করা হয় তখন আবার মুনাজাতের প্রয়োজন কি? এর উত্তর কয়েকটি হতে পারে : এক. যারা এমন করেন তারা জানেন যে, এক মিনিট নীরবতা পালনে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয়নি। তাই একটু মুনাজাত করা হল, যদি আল্লাহ্ কবুল করেন। দুই. তারা চান যে, মৃত ব্যক্তির জন্য মুনাজাত করি। কিন্তু তারা যাদের কাছে দায়বদ্ধ, যাদের তল্পিবাহক তারা এটা পছন্দ করবে না, তাই তাদের পছন্দের দিকে তাকিয়ে এমন করেন। কেননা, পশ্চিমা ইহুদি-খ্রিস্টানগণ তাদের মৃতদের সম্মানে নীরবতা পালনের এমন সংস্কৃতি চর্চা করে। তিন. এমনও হতে পারে যে, আমাদের নেতা-নেত্রীরা এক মিনিট নীরবতা পালন করে তাদের পশ্চিমা গুরুদের এ মেসেজ দিতে চান যে, দেখ, আমরা মুসলিমরা কত উদার যে আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে সাথে তোমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করি। আর তোমরা এমন সংকীর্ণমনা যে, শুধু নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন কর। তাই আমরা তোমাদের অনুগত বান্দা হলেও উদারতায় তোমাদের চেয়ে এগিয়ে। চার. এমনও হতে পারে, আমাদের নেতা-নেত্রীরা মনে করেন, যদি এক মিনিট নীরবতা পালন না করে শুধু মুনাজাত করি তবে লোকে বলবে যে, সে মুসলিম। আর আমাকে কেউ মুসলিম বলবে, এটা তো একটা লজ্জার ব্যাপার ! এ ছাড়া নীরবতা পালনের আরো কোন কারণ থাকলে থাকতেও পারে।

১৫-মৃত ব্যক্তির জায়নামাজ ও পোশাক দান করা

মৃত ব্যক্তির কল্যাণ, তার জন্য সওয়াব পাঠানোর উদ্দেশ্যে যে সকল কাজ করা হয়, তার একটি হল মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া পোশাক, জায়নামাজ—ইত্যাদি ব্যবহৃত জিনিস-পত্র কোন ইমাম বা পীর সাহেব, অথবা

আলেমকে দান করা হয়। নিয়ত করা হয় যে, যাকে দান করা হয়েছে সে যতদিন ব্যবহার করবে ততদিন মৃত ব্যক্তি এর সওয়াব পাবে। উদ্দেশ্যটা ভাল, কিন্তু সমস্যা ভিন্ন জায়গায় ; তাহল, লোকটি যখন ইন্তে কাল করল তখন থেকে তার ছোট বড় সকল সম্পদের মালিক তার উত্তরাধিকারীগণ। সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করার পূর্ব-পর্যন্ত এগুলো কাউকে দান করা যাবে না—তবে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। এগুলো হল : এক. মৃত ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় অসীয়ত করে যান যে, আমার অমুক বস্তুটি অমুককে দান করে দেবে, তবে অসীয়তের যাবতীয় নিয়ম মান্য করে দান করা যেতে পারে। দুই. ইন্তেকালের পর তার সকল ওয়ারিশগণ যদি সন্তুষ্টচিত্তে কোন বস্তু কাউকে দান করার সিদ্ধান্তে একমত হন, তবে তাতে দোষ

---

[১১] তাইসীরু আল্লাম : শরহে উমদাতুল আহকাম

[১২] শরহে মুসলিম : ইমাম নববী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৩

নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে যা দেখা যায়, তাহল : মৃত ব্যক্তির আপনজনের মধ্যে কোন ব্যক্তি—যেমন তার স্ত্রী অথবা বড় ছেলে মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র দান করেন। যদি বলা হয়, এতে সকলের সম্মতির থাকা দরকার, তখন বলা হয়, সে কি অসম্মত হবে? সে সম্মতি দেবে, অমত করবে না। এ ধরনের কাজ ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না।

১৬-লাশ ও কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত

অনেককে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেন। মৃতের লাশের কাছেও কুরআন পাঠ করতে দেখা যায়। কেউ সূরা ইয়াসীন পড়েন, কেউ পড়েন সূরা তাকাসুর। কেউ সূরা ফাতেহা পড়েন। আবার কেউ তিন বার সূরা ইখলাস পড়ে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে বহু বার কবর যিয়ারত করেছেন। তিনি কখনো কোন কবরের কাছে গিয়ে সূরা ফাতেহা, কুরআন থেকে কোন সূরা বা কোন আয়াত পাঠ করেননি। কুরআনের ফযীলত তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে ইমামদের তিনটি মত পাওয়া যায়। এক. না-জায়েয ও বিদআত। ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এ মত পোষণ করতেন। দুই. জায়েয: ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান এ মত পোষণ করতেন। তিন. শুধু দাফনকালে কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। ইমাম শাফিয়ী রহ. এ মত পোষণ করেন এবং ইমাম আহমদ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৩]

ইমাম নববী রহ. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু ব্যক্তির কবরে খেজুর ডাল গেড়ে দিয়েছিলেন এ জন্য যে খেজুর ডাল যতক্ষন তাজা থাকবেততক্ষণ জিকির করবে ফলে কবরে আযাব হবে না। যদি খেজুর ডালের জিকিরের কারণে কবর আযাব বন্ধ হয় তাহলে

কুরআন তিলাওয়াত করলে কবরের আযাব বন্ধ হবে না কেন? তাই কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা যেতে পারে।[১৪]

কিন্তু তার এ মত অনুমান নির্ভর মাত্র। এর সমর্থনে অনুমান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ নেই। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অধিক যত্নবান ছিলেন। তবে এ দু কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেননি।

মুজতাহিদ ইমামদের মতামত যা-ই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তার সাহাবাদের থেকে যা অনুমোদিত নয়, তা শরীয়ত সম্মত বলে স্বীকৃতি পাবে না কখনো। ইমামদের মতামত হল ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। এ ইজতিহাদে ভুল করলেও তারা সওয়াব পাবেন আল্লাহর কাছে। কোন কবরের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবাদের কেউ কুরআন থেকে কোন কিছুই পাঠ করেননি—না সূরা ফাতেহা না সূরা ইখলাস বা সূরা তাকাসুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতকালে কবরবাসীকে সালাম দিয়েছেন, ও তাদের জন্য দুআ করেছেন। বহু হাদীসে কীভাবে তিনি সালাম দিয়েছেন ও দুআ করেছেন—তার বর্ণনা এসেছে। যেমন তিনি কবর যিয়ারতকালে বলতেন -

---

[১৩] রিয়াজুস সালেহীন

[১৪] শরহে মুসলিম : ইমাম নববী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৩

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. (رواه مسلم 973)

হে মুমিন মুসলিম কবরবাসী ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য সুখ ও শান্তি প্রার্থনা করছি।[১৫]

১৭-জানাযা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দুআ-মুনাজাত

আমাদের দেশের অনেক স্থানে দেখা যায়, যখন জানাযা নামাজ শেষ হল তখন ইমাম সাহেব নামাজে অংশ গ্রহণকারীদের সাথে নিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ-মুনাজাত করেন। জানাযা নামাজ পড়া হল মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার জন্য মাগফিরাত কামনার জন্য দুআ-প্রার্থনা। জানাযা নামাজে তার জন্য দুআ-মুনাজাত শেষ করে আবার সাথে সাথে দুআ-মুনাজাত করার মধ্যে কি হিকমত থাকতে পারে? উদ্দেশ্য হতে পারে, আল্লাহকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, হে আল্লাহ ! মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ-মুনাজাত করার যে পদ্ধতি আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়ে গেছেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাই আমরা আবার আমাদের পছন্দ মত নিয়মানুসারে আমাদের মত করে দুআ-মুনাজাত করে নিলাম। জানাযা নামাজ শেষে দুআ-মুনাজাত করার অনুমোদন নেই। তবে দাফন শেষে কবরের কাছে দুআ করার অনুমোদন আছে। যেমন হাদীসে এসেছে—

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করতেন তখন তার কবরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর এবং তার অবিচল থাকার জন্য দুআ কর। কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।[১৬]

১৮-মৃত্যু-দিবস পালন

আমাদের সমাজে যেমন জন্ম-দিবস পালনের রেওয়াজ আছে তেমনি আছে মৃত্যু দিবস পালনের প্রথাও। এ প্রথাটি সম্পূর্ণ বিধর্মীদের। ইসলাম বা মুসলমানদের আচার নয়। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হল, মুসলিমগণ কাফেরদের অনুসরণ করে তাদের এ প্রথা মত আমল করে যাচ্ছে। যদি এটাকে ধর্মীয় আচার মনে করে করা হয় তবে তা বিদআত হিসেবে একটা গুনাহের কাজ বলে পরিগণিত হবে। আর যদি সমাজে প্রচলিত প্রথা হিসেবে করা হয় তবে তা অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণের দোষে দুষিত হবে, যা নি:সন্দেহে একটি মারাত্মক অপরাধ ও নিষিদ্ধকর্ম।

এ পদ্ধতিগুলো কি ইসলাম সম্মত?

মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব পাঠানোর উদ্দেশ্যে প্রচলিত যে পদ্ধতিগুলো আলোচিত হল সেগুলো কি ইসলামী শরীয়ত অনুমোদিত? না-কি মানুষের আবিষ্কার করা কুসংস্কার বা বিদআত? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর উত্তর দেয়ার পূর্বে কয়েকটি সর্বসম্মত মূলনীতি আলোচনা করা উচিত বলে মনে করি।

[১৫] সহীহ মুসলিম, জানাযা অধ্যায়

[১৬] আবু দাউদ, জানাযা অধ্যায়

এক. ইসলাম বলতে আমরা কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝি। কোন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান তালাশ করে না পেলে সেখানে মুসলিম ধর্মবেত্তাদের ঐক্যমত (ইজমা) অথবা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গবেষণা করে আহরিত বিধান—যাকে কিয়াস বলা হয়— গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়া অন্য কিছু ইসলামী আচার হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। আবারও বলতে হয়, যদি কোন বিষয় কুরআন ও হাদীসে দিক-নির্দেশনা পাওয়া না যায় তবেই ইজমা বা কিয়াসের প্রশ্ন আসে। অতএব কুরআন অথবা হাদীসের দিক-নির্দেশনা রয়েছে এমন কোন বিষয় ইজমা বা কিয়াসের প্রয়োজন নেই। এরূপ বিষয়ে ইজমা ও কিয়াসের আশ্রয় নিলে তা হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য সমর্থনের উদ্দেশ্যে।

দুই. আমরা মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছোনোর জন্য যা কিছু করব তা তার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোন মানুষ, সমাজ, কোন দল বা শক্তি মৃত ব্যক্তির কাছে সওয়াব পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তার কোন কল্যাণ করতে পারে না। তাই যিনি সওয়াব পৌঁছে দিবেন তার কাছে ছাওয়াবের জন্য করা সেই কাজটি গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যদি আল্লাহর কাছে কাজটি কবুল বা গ্রহণযোগ্য না হয় তবে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছার প্রশ্নই আসে না।

তিন. আল্লাহর কাছে যে কোন আমল বা নেক কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দুটি শর্তের উপস্থিতি জরুরি। যদি এ দুটো শর্তের কোন একটি অনুপস্থিত থাকে, তবে আমলটি আল্লাহর কাছে অগ্রাহ্য হবে। আল্লাহর কাছে কবুল না হলে তা মৃতের কোন উপকারে আসবে না। শর্ত দুটো হল : ইখলাস ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পদ্ধতির অনুসরণ।[১৭]

প্রথম শর্ত ইখলাস ; অর্থাৎ কৃত সৎকর্মটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত ব্যতীত অন্য কোন নিয়তে করা হলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

দ্বিতীয় শর্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য। কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হল ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর রাসূল কর্তৃক কাজটি অনুমোদিত হয়নি, তাহলে এ কাজও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. (مسلم 12/ 16)

অর্থ : যে কেউ এমন আমল করবে যা করতে আমরা (ধর্মীয়ভাবে) নির্দেশ দেইনি তা প্রত্যাখ্যাত।[১৮] যেমন কোন ব্যক্তি নামাজ পড়ল কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে নয়, অন্য নিয়তে। তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে নামাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতিতে পড়া হয়। এমনিভাবে, কেউ সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একশ ভাগ নিয়তে নামাজ পড়ল, তবে তা কবুল হবে না। কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করেনি।

উপরোল্লেখিত আলোচনায় আমরা যে ফলাফল পেলাম তা হল:—

(ক) মৃত ব্যক্তির জন্য যা কিছু করা হবে তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে করতে হবে।

(খ) মৃত ব্যক্তির জন্য যা কিছু করা হবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। যদি অনুমোদিত না হয় তবে তা হবে প্রত্যাখ্যাত। তাতে কোন সওয়াবই হবে না। সওয়াব না হলে মৃতের কাছে পৌঁছার কিছু থাকে না।

---

[১৭] আ'লাম আস-সুন্নাহ আল-মানশুরাহ

[১৮] মুসলিম (১২/১৬)

(গ) কুরআন ও হাদীসে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে কোন কিছু করার দিক-নির্দেশনা আছে কি-না? উত্তর : অবশ্যই আছে। যদি থেকেই থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে কোন কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন সমাজ বা ধর্মের প্রথা কখনো এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যাবে না। সকল মানুষ জানে এবং স্বীকার করবে যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাঁর অনেক প্রিয়জন, আপনজন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকাল করেছেন প্রিয়তমা সহধর্মিণী খাদিজা রা., মেয়ে রুকাইয়া রা., ছেলে কাসেম, তাইয়েব, ইবরাহীম। প্রিয়তম চাচা হামযা রা. তাঁর প্রিয় আরো বহু সহচর। কিন্তু তিনি কখনো তাদের কারো জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকাল হল। তাঁর সাহাবায়ে কেরাম শোকে দিশেহারা হলেন। ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। কিন্তু তারা কি কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইছালে ছাওয়াবের জন্য কোন অনুষ্ঠান করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর যুগে খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর রা. ইন্তেকাল করলেন। উমর রা. উসমান রা. আলী রা. শহীদ হলেন। তারা কি তাদের জন্য এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান করেছেন? করেননি কখনো। তাই কোন রকম দ্বিধা ছাড়া বলা যায় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, তাদের পরবর্তীকালের তাবেইন ও ইমামগণ কেউই কারো জন্যে কুলখানী, ফাতেহা পাঠ, চেহলাম, মাটিয়ালভোজ, মীলাদ, খতমে তাহলীল, কুরআন খতম, কাঙ্গালী ভোজ, ওরস, ইছালে ছাওয়াব মাহফিল, উরসে কুল, কবরের কাছে কুরআন পাঠ, মৃত্যু-দিবস পালন, কবরে ও কফিনে ফুল দেয়া, এক মিনিট নীরবতা পালন, জানাযার নামাজের পর মুনাজাত—কোনটিই করেননি।

তিনি বহুবার তার প্রিয়জনদের কবর যিয়ারত করেছেন। কবর যিয়ারত করতে গিয়ে তিনি কি বলেছেন, কি কী দুআ পড়েছেন তা হাদীসের কিতাবে সংরক্ষিত আছে। তিনি তো কখনো কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। কাউকে করতেও নির্দেশ দেননি। তারপর তার সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। তারা কারো কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কবরের কাছে কুরআন পাঠ করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। এগুলো বিদআত। এর মাঝে কিছু কিছু কাফেরদের আচার হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত। আবার কোনটি কাফেরদের ধর্মীয় আচার থেকে মুসলমানরা কিছুটা সংশোধিত আকারে চালু করেছে। কাজেই এগুলো কিছুই করা যাবে না। করলে সওয়াব হবে না ; বরং গুনাহ হবে। মৃত ব্যক্তির কাছে কিছুই পৌঁছোবে না। সবই বৃথা যাবে। অনেকে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ-মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে তার ঘরে একত্রিত হয়ে দুআ-অনুষ্ঠান করে থাকেন। মনে করেন এতে অসুবিধা নেই। আমরা তো মীলাদ পড়ছিনা। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এর বৈধতা কতটুকু তা কি ভেবে দেখেছেন?
হাদীসে এসেছে -

قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.

(أخرجه الإمام أحمد – 6905)

সাহাবী জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, মৃত ব্যক্তির দাফন করার পর তার পরিবারের কাছে জমায়েত হওয়া ও খানা-পিনার ব্যবস্থা করাকে আমরা জাহেলী যুগের নিয়াহা হিসেবে গণ্য করতাম। (বর্ণনায় : ইমাম আহমদ)

নিয়াহা হল: মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে আনুষ্ঠানিক কান্নাকাটির আয়োজন করা। জাহেলী যুগে এ প্রথা চালু ছিল। ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে।

সাহাবী জরীর রা. এর প্রতিনিধি দল যখন উমর রা. এর কাছে আসল, তখন উমর রা. তাদের প্রশ্ন করলেন:

هل يناح على ميتكم؟ قال : لا، قال: وهل يجتمعون عند الميت،ويجعلون الطعام؟ قال: نعم، قال: ذلك النوح. (المغني لابن قدامة 2/ 550)

'তোমরা কি তোমাদের মৃতদের জন্য নিয়াহা কর? তারা বলল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি মৃত ব্যক্তির কাছে একত্র হয়ে থাকো এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকো? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন: এটাইতো নিয়াহা।

অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য এমন কোন অনুষ্ঠান করা ঠিক নয় যা হাদীসে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলো সবই বেদআতের মধ্যে গণ্য হবে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল প্রকার বিদআত বা নব-আবিষ্কার প্রত্যাখ্যান করা মুসলমানের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (رواه البخاري 2697 ومسلم)

অর্থ : যে আমাদের এ ধর্মে এমন কিছুর প্রচলন করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১৯] হাদীসে আরো এসেছে

عن جابر رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. (رواه مسلم 3/ 153)

সাহাবী জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার খুতবায় বলতেন : আর শুনে রেখ ! সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব ও সর্বোত্তম পথ-নির্দেশ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ-নির্দেশ। ধর্মে নতুন বিষয় প্রচলন করা সর্ব নিকৃষ্ট বিষয়। এবং সব ধরনের বিদআতই পথভ্রষ্টতা।[২০]

যারা এ সকল কাজ করেন তাদেরকে যখন আমরা বলি : এগুলো আল্লাহর রাসূল করেননি, তাঁর সাহাবাগণের কেউ করেননি বা করার জন্য বলেননি, তাই এগুলো বিদআত। তারা উত্তরে বলেন : হ্যা, বিদআত ঠিকই, কিন্তু এগুলো বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত। তাদের এই উক্তিটিও আসলে একটি বিদআত।[২১] কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তার সাহাবায়ে কেরামের কেউ বলেননি যে, বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত বলে কিছু আছে। বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন

كل بدعة ضلالة অর্থ : সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ) তাই ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন

من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول (اليوم أكملت لكم دينكم) فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً.

[১৯] বুখারী ও মুসলিম
[২০] মুসলিম
[২১] সুন্নাত ও বিদয়াত ঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম

অর্থ : যে ব্যক্তি ইসলামের মাঝে কোন বিদআতের প্রচলন করে, আর তাকে হাসানাহ বা ভাল বলে মনে করে, সে যেন প্রকারান্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে খিয়ানত করেছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন : 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম।' সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যা ধর্মরূপে গণ্য ছিল না, আজও তা ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না।[২২]

অনেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম মাইকে আযান দেননি ; আমরা মাইকে আযান কেন দেব? এটা কি বিদআত নয়? এটা বিদআত হলে কোন ধরনের বিদআত? এটাইতো বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেগুলো বিদআতে হাসানা বলে স্বীকার না করে গত্যন্তর নেই।' আসলে এটা একটা বিভ্রান্তি। এ ধরনের বিষয়গুলো বিদআতে হাসানা নয়। এগুলো হল সুন্নতে হাসানা। যে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :—

من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. (رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما. رقم الحديث 7/ 102-104)

অর্থ : যে ইসলামে কোন ভাল পদ্ধতি প্রচলন করল, সে তার সওয়াব পাবে এবং সেই পদ্ধতি অনুযায়ী যারা কাজ করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে, তাতে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ পদ্ধতি প্রবর্তন করবে সে তার পাপ বহন করবে, এবং যারা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করবে, তাদের পাপও সে বহন করবে, তাতে তাদের পাপের কোন কমতি হবে না।[২৩]

বিদআত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য কিছু কথা এখানে বলতে হয়। প্রথম কথা : বিদআত বা নব আবিষ্কার সকল ক্ষেত্রে নিন্দিত নয়। শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে যা কিছু নব-আবিষ্কার সেটা হল নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিদআতকে নিষিদ্ধ করেছেন। আর শরীয়তের পরিভাষায় এটাকেই বিদআত বলা হয়। দ্বিতীয় কথা : ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া মানব কল্যাণের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নব-আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য। এই নব-আবিষ্কারকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি, বরং উৎসাহিত করেছে। তৃতীয় কথা : ধর্মীয় কোন বিধি-বিধান বা আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে কোন কিছুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা বা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা বিদআতের মধ্যে গণ্য হবে না। যেমন আযান দেয়ার জন্য মাইকের ব্যবহার, সালাত ও রোযার সময় জানতে ঘড়ি, কম্পাস ও ক্যালেন্ডারের ব্যবহার—ইত্যাদি বিদআতের মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ, কেউ এগুলোকে ধর্মের অংশ মনে করে না। বা এগুলোর মাধ্যমে ধর্মে কোন নতুন আচর চালু হয়নি। বরং, যা হয়েছে তাহল প্রাচীন আচারের অবকাঠামো ঠিক রেখে তা বাস্তবায়নে আধুনিক পদ্ধতির অবলম্বন যা শরীয়তের পরিভাষায় ভাল ও উপকারী পদ্ধতি বা সুন্নাতে হাসানা বলা যায়। বিদআত নয়।

মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব পাঠানোর উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় সবগুলো ধর্মীয় আচার মনে করে করা হয়। সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যেই করা হয়। অতএব, বর্ণিত সকল অনুষ্ঠান বিদআত। বিদআতের ক্ষতি অনেক এবং সুদূর প্রসারী। যার বিস্তারিত আলোচনা এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। বিদআত ধর্মকে বিকৃত করে। ইসলামে বিদআতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিদআতী আচার-অনুষ্ঠান করার কারণে রাসূলুল্লাহ

[২২] আল-ইতেসাম ঃ ইমাম শাতেবী

[২৩] মুসলিম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে যায়।[২৪] মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছাওয়াবের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন : দেখবেন, এ ক্ষেত্রে বিদআতী নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশিত ও অনুমোদিত পদ্ধতিকে পরিহার করা হচ্ছে। এ সকল অনুষ্ঠানাদি করতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ খরচ করা হয়, তার সকল ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে যথাযথ অনুমতি না নিয়ে, অন্যায়ভাবে। এতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করে তা দিয়ে ছাওয়াবের কাজ করলে তা কবুল হবে না। যখন কবুল হবে না, তখন তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছার ধারণা করা অবান্তর।

ইছালে ছাওয়াবের জন্য কী করা যেতে পারে

কোন মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে, তখন তার আপনজনেরা স্বজন হারানোর ব্যথায় থাকে চরমভাবে ব্যথিত। ভাবতে থাকে যে, আপনজন চিরদিনের জন্য চলে গেলেন ; তার উপকার হয়—এমন কিছু করা যায় কি-না। এ ব্যাপারে আন্তরিকতার কোন অভাব থাকে না। সন্ধান করতে থাকে কী করা যায় তার জন্য। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকার কারণে অনেকেই এক্ষেত্রে সঠিক দিক-নির্দেশনা পায় না, তাই হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত। ফলে, সে কল্যাণকর মনে করে এমন কিছু করে, যা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। এমন কাজ করে, যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং, তার কাজগুলো বিদআত ও সুন্নাহ পরিপন্থী হওয়ার কারণে গুনাহ হয়। ভাবতে গিয়ে অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন দেখা যায় যে, হাদীসে রাসূলে এ সম্পর্কে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে তা পাশ কাটিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার তথা বিদআতের আশ্রয় নেয়া হয়। এমন কাজ করা হয়, যা কোনভাবেই মৃত ব্যক্তির কল্যাণে আসে না ; এবং এগুলো যে মৃত ব্যক্তির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে, তার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। তাই দেখা যাক এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কী নির্দেশনা রয়েছে।

[২৪] শরহে রিয়াদুস সালেহীন মিন কালামে সায়্যিদিল মুরসালীন ঃ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন

এক. মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা :

আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. (الحشر :10)

'যারা তাঁদের পরে এসেছে তারা বলে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের যে সকল ভাই পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষমা কর।'[২৫] এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সকল মুসলিম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তাই বুঝে আসে মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাতের দুআ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যদি এটা তাঁদের জন্য কল্যাণকর না হত, তবে আল্লাহ তা করতে আমাদের উৎসাহিত করতেন না। এমনিভাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ-প্রার্থনা করার কথা কুরআনের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে—

عن أبي أسيد الساعدي قال سأل رجل من بني سلمة فقال يارسول الله هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما بعد موتهما، فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما.رواه أبو داود وابن ماجة

—সাহাবী আবু উসাইদ আস-সায়েদী রা. কর্তৃক বর্ণিত যে, বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন কল্যাণমূলক কাজ আছে যা করলে পিতা-মাতার উপকার হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, আছে। তাহল, তাদের উভয়ের জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা। উভয়ের মাগফিরাতের জন্য দুআ করা। তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা।[২৬]

হাদীসে এসেছে—

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.رواه مسلم 1631 والنسائ 3591

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজের ফল সে পেতে থাকে—১. সদকায়ে জারিয়াহ (এমন দান যা থেকে মানুষ অব্যাহতভাবে উপকৃত হয়ে থাকে) ২. মানুষের উপকারে আসে এমন ইলম (বিদ্যা) ৩. সৎ সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।[২৭] এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে : সন্তান যদি সৎ হয় ও পিতা-মাতার জন্য দুআ করে তবে তার ফল মৃত পিতা-মাতা পেয়ে থাকেন।

দুই. মৃত ব্যক্তির জন্য দান-সদকাহ করা ও জনকল্যাণ মূলক কাজ করা :

হাদীসে এসেছে—

---

[২৫] সূরা হাশর : ১০

[২৬] আবু দাউদ ও ইবনে মাজা

[২৭] মুসলিম ও নাসায়ী

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.رواه البخاري 1388 و مسلم 1004

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল যে, আমার মা হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছেন, কোন কিছু দান করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয় যদি তি কথা বলতে পারতেন তবে কিছু সদকা করার নির্দেশ দিতেন। আমি যদি তার পক্ষে সদকা করি তাহলে তিনি কি তা দিয়ে উপকৃত হবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ।[২৮] হাদীসে এসেছে—

عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر بئرا وقال : لأم سعد. رواه النسائي 3589 وأحمد

সাহাবী সা'দ বিন উবাদাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। কী ধরনের দান-সদকা তার জন্য বেশি উপকারী হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'পানির ব্যবস্থা কর'। অত:পর তিনি (সা'দ) একটা পানির কূপ খনন করে তার মায়ের নামে (জন সাধারণের জন্য) উৎসর্গ করলেন।[২৯] হাদীসে আরো এসেছে

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها، قال نعم، قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه النسائي 3595

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যু বরণ করেছে। যদি আমি তার পক্ষে ছদকাহ (দান) করি তাহলে এতে তার কোন উপকার হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এরপর লোকটি বলল, আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি আমার একটি ফসলের ক্ষেত তার পক্ষ থেকে সদকাহ করে দিলাম।[৩০]

তিন. কুরবানী করা :—যেমন হাদীসে এসেছে—

عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين (مخصيين)، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح آخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم . (رواه ابن ماجة 3113 وصححه الألباني)

[২৮] বুখারী : ১৬৩১ ও মুসলিম ৩৫৯১
[২৯] নাসায়ী ও মুসনাদ আহমদ
[৩০] নাসায়ী, ৩৫৯৫

আয়েশা রা. ও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরবানী দিতে ইচ্ছা করলেন তখন দুটো দুম্বা ক্রয় করলেন। যা ছিল বড়, হৃষ্টপুষ্ট, শিং ওয়ালা, সাদা-কালো বর্ণের এবং খাসি। একটা তিনি তার ঐ সকল উম্মতের জন্য কুরবানী করলেন, যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছে ও তার রাসূলের রিসালাত পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে, অন্যটি তার নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য কুরবানী করেছেন।[৩১]

চার. মৃতদের পক্ষ থেকে তাদের অনাদায়ি হজ উমরা, রোযা আদায় করা : বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মৃত ব্যক্তির অনাদায়ি হজ, উমরা, রোযা—ইত্যাদি আদায় করা হলে তা মৃতের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। যেমন তাদের পক্ষ থেকে তাদের পাওনা আদায় করলে তা আদায় হয়ে যায়।[৩২]

উল্লেখিত হাদীসসমূহে মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় সম্পর্কে যে দিক-নির্দেশনা আমরা পেলাম তা হল মৃত ব্যক্তির জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দুআ করা। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাদের ইছালে ছাওয়াবের জন্য অধিকতর স্থায়ী জনকল্যাণ মূলক কোন কাজ করা। যেমন মানুষের কল্যাণার্থে নলকূপ, খাল-পুকুর খনন, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, মাদরাসা-মসজিদ, পাঠাগার নির্মাণ। দ্বীনি কিতাবাদী-বই-পুস্তক দান, গরিব-দু:খী, অভাবী, সম্বলহীনদের দান-সদকা করা। মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামী প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হয়—এমন সদকা বা দান। মৃত মাতা-পিতার বন্ধু বান্ধবদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা। তাদের রেখে যাওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

আমাদের বিদায়ি আপনজনদের জন্য এমন কিছু করা উচিত যা সত্যিকারার্থে তাদের কল্যাণে আসে। এবং এ ব্যাপারে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার, বিদআত, মনগড়া অনুষ্ঠানাদি পরিহার করে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনায় কাজ করা কাম্য। কেননা, যে সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে অনুমোদন নেই তা বিদআত হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত। তা যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন, তা মৃত ব্যক্তির কোন উপকারে আসে না। বরং, আয়োজনকারীরা গুনাহগার হয়ে থাকেন।

এ সকল হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়টি বার বার জিজ্ঞাসা করেছেন যে, মৃত আপনজনের জন্য আমরা কি করতে পারি? মৃত মাতা-পিতার জন্য কি করা যেতে পারে? তিনি এর উত্তরে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কোথাও তো বললেন না মীলাদ পড়াও, কুরআন খতম কর, খতমে তাহলীল আদায় কর, চেহলাম ও কুলখানি কর, ফাতেহা পাঠ কর, কবরে ফুল দাও, ইছালে ছাওয়াব মাহফিল কর, ওরস কর, প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন কর, তার কবরের কাছে যেয়ে কুরআন পাঠ কর...। রহমাতুল লিল আলামীন দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করলে চির বিদায় হয়ে যাওয়া মানুষটির উপকার হবে সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই আদর্শ রেখে গেছেন ! আমরা কি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি বুঝে গেছি যে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করে মৃত ব্যক্তির উপকার সাধনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি ? তিনি তো ছিলেন তার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে দয়ার্দ্র। আল্লাহ নিজেই তার সম্পর্কে বলেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (التوبة : 128)

'অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। যা তোমাদের বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।'[৩৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত মানুষের জন্য সন্দেহাতীতভাবে সীমাহীন কল্যাণকর।

---

[৩১] ইবনে মাজা

[৩২] মুসলিম, ১৯৩৫

[৩৩] সূরা তাওবা : ১২৮

আমাদের অনেকে মৃত ব্যক্তির জন্য অনুষ্ঠান করে থাকেন। ধরুন তাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হল। যদি এ টাকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনা মত নলকূপ খনন করা যেত তাহলে কম করে হলেও দশটি নলকূপ খনন করে মানুষের স্থায়ী উপকার করা যেত বা এ জাতীয় স্থায়ী জনকল্যাণমূলক কাজ করা যেত। যা দিয়ে মানুষ যুগের পর যুগ উপকার লাভ করতে পারত। এমনিভাবে যদি কোন দীনি মাদরাসায় ভবন নির্মাণ করে দেয়া হলে, তাতে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় দুভাবে। প্রথমত: মাদরাসা ঘরের ব্যবস্থা করার সওয়াব। দ্বিতীয়ত: ইলম চর্চার সওয়াব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পদে পদে এভাবেই মানুষকে কল্যাণকর পথের দিশা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আরেকটি প্রনিধানযোগ্য হাদীস হচ্ছে—

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته من بعد موته. رواه ابن ماجه رقم 249

আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'মুমিনের ইন্তেকালের পর তার যে সকল সৎকর্ম তার কাছে পৌঁছে তা হল, সে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যাওয়া যার প্রচার অব্যাহত থাকে, সৎ সন্তান রেখে যাওয়া, কুরআন শরীফ দান করে যাওয়া, মসজিদ নির্মান করে যাওয়া, মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা নির্মান করে যাওয়া, কোন খাল খনন করে প্রবাহমান করে দেওয়া অথবা এমন কোন দান করে যাওয়া যা দ্বারা মানুষেরা তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর উপকার পেতে থাকে।'[৩৪]

এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল—

এক. জীবদ্দশায় এমন কিছু ভাল কাজ করা যেতে পারে যার সুফল মৃত্যুর পর পাওয়া যায়।

দুই. মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কল্যাণকর কাজের কিছু নমুনা দেয়া হয়েছে বর্ণিত হাদীসে। যাকে ছদকায়ে জারিয়া বলা হয়।

তিন. সৎ সন্তান এমন এক সম্পদ মৃত্যুর পরও পিতা-মাতা তার দ্বারা উপকার পেয়ে থাকেন।

চার. হাদীসে বলা হয়েছে সৎ সন্তানের দুআ মৃত্যুর পর পিতা-মাতার কাজে আসে। তাই অসৎ সন্তানের দুআ কাজে আসবে এমনটি এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সন্তানকে সৎ বানাতে প্রচেষ্টা চালানো এমন একটি মহৎ কাজ যার সুফল মৃত্যুর পরও পিতা-মাতা ভোগ করতে থাকে।

পাঁচ. এমন জ্ঞান যা মানুষের কল্যাণে আসে তা শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষার কাজে সহযোগিতা করা একটি ছদকায়ে জারিয়া। দীনি ইলম তো অবশ্যই কল্যাণকর।

ছয়. এ হাদীসে মুমিন ব্যক্তিকে এমন কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে যা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কাজে আসবে। তাই নিজের ইছালে ছাওয়াবের জন্য প্রত্যেকেই নিজ জীবনে কিছু কাজ করে যেতে পারাটা একটা বিশাল অর্জন।

সকল প্রকার নেক আমল কি মৃত ব্যক্তির জন্য নিবেদন করা যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য যে সকল নেক আমল নিবেদনের কথা বর্ণিত হয়েছে বা অনুমোদিত হয়েছে সে সকল আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠানো যায় এ ব্যাপারে কারো দ্বি-মত নেই। এর বাইরে অন্যান্য সকল নেক আমল যেমন কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-

[৩৪] ইবনে মাজা, হাদীসটি সহীহ

আজকার ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির ইছালে ছাওয়াবের জন্য আদায় করা যাবে কি না এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে ।

প্রথম মত: যে সকল নেক আমল মৃত ব্যক্তির জন্য নিবেদন করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুমতি ও অনুমোদন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, শুধু সে সকল আমলই মৃত ব্যক্তির ইছালে ছাওয়াবের জন্য করা যাবে। এ ছাড়া অন্য কোন নেক আমল ইবাদত-বন্দেগী মৃত ব্যক্তির ছাওয়াবের জন্য প্রেরণ করা যাবে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সহ বহু আলেম ও ধর্মবেত্তাগণ এ মত পোষণ করেন।[৩৫]

দ্বিতীয় মত: সকল প্রকার নেক আমল যা হাদীস ও কুরআনে নেক আমল বলে স্বীকৃত তার সকল কিছুই মৃত ব্যক্তির জন্য নিবেদন করা যায়। এ মত পোষণ করেন ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম আহমদ রহ. সহ অনেক ইমাম। তাদের যুক্তি হল : যে ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগী বা কোন নেক আমল করবে তার মালিক সে। সে যাকে ইচ্ছা তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যে সকল নেক আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি সে সকল সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছেন, রোযা, হজ, সদকা ইত্যাদি। তাকে যদি কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, সালাত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হত, তাহলে তিনি অনুমতি দিতেন এবং বলতেন : হ্যাঁ, এগুলো মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তোমরা করতে পার। অতএব যে সকল নেক আমল সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে অনুমতি দিয়েছেন শুধু সেগুলো মৃত ব্যক্তির ছাওয়াবের জন্য করা যাবে অন্য কিছু করা যাবে না এ কথা ঠিক নয়।[৩৬]

কোন মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ

যে সকল নেক আমল শরীয়ত অনুমোদিত তার সবগুলোই কি মৃত ব্যক্তির ইছালে ছাওয়াবের জন্য নিবেদন করা যাবে? নাকি নির্দিষ্ট কিছু বিষয় এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ? আসলে এ ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ ইমামদের মত অধিকতর বিশুদ্ধ। কয়েকটি কারণে : এক. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে দয়ার্দ্র। জীবিত ও মৃত সকলের প্রতি। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল মৃত ব্যক্তির উপকারের জন্য কি করা যায়। তখন তিনি সব কিছুর কথা বলে দিতে পারতেন। তিনি উম্মতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। উম্মতকে শিক্ষা দিতে কখনো কোন কার্পণ্য করেননি। এটা সকলের কাছেই সত্য। তাই তিনি প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন সেটুকুই অনুমোদিত। যা বলেননি তা অনুমোদিত নয়। দুই. যদি বলা হয়, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যদি প্রশ্ন করা হত : মৃত ব্যক্তির ইছালে ছাওয়াবের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে কি-না? তাহলে তিনি অনুমতি দিয়ে দিতেন। তাই মৃত ব্যক্তির ইছালে ছাওয়াবের জন্য কুরআন তিলাওয়াত জায়েয আছে।' আমরা যদি এ ধরনের একটি মূলনীতি প্রণয়নের পথ খুলে দেই, তাহলে সকলে তো এ কথাই বলবে যে, এ বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করলে তিনি অনুমোদন দিয়ে দিতেন, যেমন তিনি অনুমোদন দিয়েছেন অমুক অমুক বিষয়ে। তিনি যা অনুমোদন করেননি তা কখনো অনুমোদিত বলে ধরা হবে না। এটা সকলের কাছে যুক্তিসংগত এবং নিরাপদ বলে মনে হবে। দ্বিতীয় মতটি যুক্তি নির্ভর, হাদীস নির্ভর নয়। অতএব, মৃত ব্যক্তির ইছালে ছাওয়াবের জন্য শুধু ঐ সকল আমলই করা যাবে যেগুলো করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমোদন দিয়েছেন। যে সকল নেক আমল মৃত ব্যক্তির ছাওয়াবের জন্য করার কথা তিনি বলে যাননি তা করা যাবে না। এটা যে বিশুদ্ধ ও সবচেয়ে নিরাপদ ও সতর্ক পথ তা ভিন্নমত পোষণকারীরাও স্বীকার করে থাকেন।

---

[৩৫] মজমু আল-ফাতাওয়া : ইবনে তাইমিয়া রহ.

[৩৬] শরহু আল-আকীদাহ আত-তাহাভীয়্যাহ : আলী ইবনে আবিল ইয আল-হানাফী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৭৩

সমাপ্ত